

## শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুযাম্মিল আলী

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি অনেকটা এ দেশে ইসলাম প্রবেশকালীন সময়ে এখানকার মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণ করার ধরণ ও প্রকৃতি অবগত হওয়ার উপরে নির্ভরশীল। সে জন্য নিম্নে উপর্যুক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এখানকার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থাঃ

বর্তমান বাংলাদেশ নামের স্বাধীন ও সার্বভৌম এ দেশটি অতীতে ভারত উপমহাদেশের একটি অংশ ছিল। ১৭৫৭ সালে এদেশে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর ১৯৪৭ সালে তা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর ১৯৭১ সালে তা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে জনসংখ্যার দিক থেকে এ দেশটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

এদেশটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে হিন্দু প্রধান দেশ ভারতের দ্বারা বেষ্টিত। এর দক্ষিণে রয়েছে মায়ানমার ও বঙ্গোপসাগর। এর আয়তন হচ্ছে ৫৫৫৯৮ বর্গ মাইল। এর জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম। সুদূর অতীত কাল থেকেই এ দেশের মানুষ মানব রচিত বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত ছিল। এ সব ধর্মের মধ্যে বহুল প্রচলিত ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। তারা এ দু'টি ধর্মের বিভিন্ন রাজা-বাদশা এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা সর্বদাই নির্যাতিত ও শোষিত ছিল। এ ছাড়াও সাধারণ লোকেরা হিন্দু ধর্মের বর্ণ বৈষম্য ও সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম কানুনের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত ছিল।

ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণ ও পরিবেশে এদেশে ইসলামের শুভাগমন ঘটে। হিজরী প্রথম শতকে যদিও কোনো কোনো আরব বণিকদের মাধ্যমে এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়,[1] তবে খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম ও নবম শতকেই এদেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে বিপুল সমারোহে। বণিকগণ চট্টগ্রামের তৎকালীন সামুদ্রিক বন্দর দিয়ে সে এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে তারা নিজেদের জন্য একটি উপনিবেশ তৈরী করে সেখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন।

এমনকি ১৭২ হিজরী সনে খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে তারা নদী পথে বর্তমান রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলেও পৌঁছেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[2] তাদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দাওয়াতে

এদেশের সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে সে সময়ে যারা এ সব এলাকায় এসে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে তাদের কারোরই নাম জানা সম্ভবপর হয় নি।

এরপর খ্রিষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর এ সুদীর্ঘ সময়ে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন ইসলামী দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষত আরব, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান ও এশিয়া মাইনরের মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর ভারত থেকে বহু আলিমে দ্বীন ও ওলিগণ এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে ধারাবাহিকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন।[3] এ দীর্ঘ সময়ে ইসলাম প্রচারের এ যুগটিকে মোট তিন যুগে বিভক্ত করা যায় :

১. প্রাথমিক যুগ বা শৈশবকাল : খ্রিষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ যুগটি বিস্তৃত ছিল।
২. যৌবন কাল : খ্রিষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগটি বিস্তৃত ছিল।
৩. পতনের যুগ : খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগে বিভিন্ন কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার দুর্বল হয়ে পড়ে।

তাদের ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি :

এ তিন যুগের ইসলাম প্রচারকগণ তাঁদের কর্মের পদ্ধতিগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের একদল 'আবেদ' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের পথ পরিহার করে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের মাঝে রয়েছেন শাহ সুলতান বলখী, যিনি প্রারম্ভে ঢাকার হরিরামপুরে এবং পরে ৪৩৯ হিজরীতে বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এ নীতির উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, যিনি ৪৪৫হিঃ/১০৫০ সালে বর্তমান নেত্রকোনা জেলার 'মদনপুর' এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের আমলে ১০৮২/১৬৭১ সালে তাঁর নির্দেশে সেখানে তাঁর কবর নির্মাণ করা হয়।

এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শেখ জালাল উদ্দিন তবরৈয়ী, যিনি বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর এ দেশে আগমন করেছিলেন এবং ৬২২হিঃ/১২২৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ নেয়ামত উল্লাহ (মৃত ১০৭৫হিঃ/১৬৬৪ খ্রি.) এবং শেখ ফরীদ উদ্দিন ও অন্যান্য বহু দরবেশগণ।[4]

ইসলাম প্রচারকদের দ্বিতীয় দল 'গাযী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন :

'বাবা আদম শাহী' যিনি ১১৫৭-১১৭৯ সালের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু রাজা 'বলরাম সেন'-এর আমলে ঢাকার 'বিক্রমপুর' এলাকায় এসে ইসলাম প্রচার করেন।

তন্মধ্যে আরো রয়েছেন : 'মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ' যিনি খ্রিষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাবনা জেলার 'শাহজাদপুর' এলাকায় আগমন করেছিলেন।

আরো রয়েছেন : 'শাহ তুরকান শহীদ' যিনি তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গাযী হিসেবে বগুড়া জেলায় আগমন করেছিলেন।

আরো রয়েছেন : ‘সৈয়দ আহমদ কাল্লা শহীদ’, উলূগই আ‘জম জা‘ফর খাঁন গাযী (মৃত- ৭১৩হি), শাহ জালাল (মৃত ৯৭০হি:/১৫৬২ খ্রি.) এবং অন্যান্য গাজীগণ।[5]

এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে আগত এ সকল ‘আবিদ, যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী) আলেম ও গাযীদের সততা, নিষ্ঠা ও চরিত্র মাধুর্যতা এবং তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত কারামতসমূহ (অলৌকিক কার্যকলাপ) পর্যবেক্ষণ করে এ দেশের সাধারণ লোকেরা প্রভাবিত হয়ে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

জনগণের ইসলাম গ্রহণের ধরণ ও প্রকৃতি:

জনগণের ইসলাম গ্রহণের অবস্থাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে তাদেরকে দু’ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাদের প্রথম ভাগে রয়েছেন এমন সব লোকেরা যারা ইসলামকে ভাল করে বুঝে-শুনে, অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তা একটি সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই তাতে প্রবেশ করেছিলেন এবং এর সাথে সাথে তারা তাদের অতীত ধর্মের যাবতীয় শিকী বিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে তাওহীদী চিন্তা ও চেতনায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন এমন সব লোক যারা তাদের অতীত ধর্মের বিবিধ বিশ্বাসের উপর বহাল থেকে শুধুমাত্র সে-সব বিশ্বাসের নাম পরিবর্তন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। তাদের পরিবর্তিত বিশ্বাসের মধ্যে ছিল- ব্রহ্মা দেবতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতিতে অবতার হয়েছেন এবং বিষ্ণু দেবতা রাসূল রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।[6]

সে সময়ে ভারত উপ-মহাদেশের সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণের প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে গোপাল হালদার বলেন : “আর ইহাও আমরা জানি যে, এই নতুন ইসলামকে জনসাধারণ স্বভাবতই তাহাদের পূর্ব পরিচিত জিনিষের আঁধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল। নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লাহ, বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলিমদের পীর, স্তম্ভ হইতেছিল দরগাহ, পুরাতন দেবলীলার কাহিনী নতুন পীরের কেছায় পরিণত হইতেছিল।... ইহাই ছিল ভারতীয় ইসলামের একটা জনগ্রাহ্য রূপ।”[7]

এ ধরনের মুসলিমরা নতুন জীবনের, নতুন চেতনার, নতুন সংস্কৃতির, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোর পথে চলার পরিবর্তে শুধুমাত্র লেবাছ পরিবর্তন করেছিল। প্রার্থনার স্থান ও ভাষা পরিবর্তন করেছিল। হিন্দু নামের পরিবর্তে মুসলিম নাম রেখেছিল মাত্র। ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরেছিল, উত্তরীয় রেখে টুপি নিয়েছিল, জলের বদলে পানি বলেছিল, মন্দিরের পরিবর্তে মসজিদে এসেছিল, শশ্মানের পরিবর্তে গোরস্থানে এসেছিল। ব্যস এ পর্যন্তই। তাওহীদের মর্মকথা, আল্লাহর উলূহিয়াত ও তাওহীদ, তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে ব্যবধান কী, এ সব তারা জানতে পারে নি। ফলে তারা আল্লাহ ও ভগবানের মধ্যে কী তফাৎ রয়েছে তা জানতে পারে নি। পার্থক্য এটুকু ছিল যে, পূর্বে তারা রাম মূর্তির কাছে ধর্না দিতো, এখন তারা মুসলিমের মৃত ওলি আওলিয়ার কবরে হাঁটুগেড়ে মাথা লুটিয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলো।

সে কালের মুসলিমরা যে ইসলামকে হিন্দু সংস্কৃতির আঁধারে ঢেলে সাজিয়েছিল, তা সে সময়কার বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীর মাঝেও প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল।[8] তারা মক্কা ও মদীনাকে ঠাকুর জগন্নাথ ও কাশীধামের সাথে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করে নি।[9] তারা কর্মের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা আর শ্রীবিষ্ণু বলাকে একই মনে করতেন। এমনকি আল্লাহ, রাম ও রহীম এ দু’অংশে বিভক্ত বলেও বিশ্বাস করতেন।[10]

সে সময়কার সাধারণ মুসলিমদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয় তারা মুসলিম হয়েছিল ঠিকই, তবে কেনইবা তারা মুসলিম হলো, ইসলামী সংস্কৃতি আর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতির মাঝে তফাৎটা কোথায়, তা

তারা বুঝে উঠতে পারেন নি। অতীতে তারা যেমন তাদের দেব-দেবীদেরকে তাদের এবং ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং বিভিন্ন রকমের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে ভাবতো, মুসলিম হয়েও তেমনি তারা মুসলিম ওলি ও দরবেশদেরকে সে সব কিছুর মালিক বলে ভাবলো। এ অবস্থা শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ অবস্থা তৎকালীন সকল মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও বিস্তৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

“হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে এইভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করার এবং এই আদর্শের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলার এই প্রবণতা শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে ইহা সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছিল। ইহার অবশ্যসম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জলদেবতা বরুণ পীর বদরে, গৌরচন্দ্র গোরচাঁদ পীরে, ওলাই চন্দ্রী-ওলাবিবিতে, সত্যনারায়ণ সত্যপীরে, লক্ষ্মীদেবী মা বরকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেবদেবীগণ মুসলিমদের নিকট তাহাদের প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধা অব্যাহতভাবেই পাইতে থাকেন। তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা বা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর এবং কোনো কবরের সহিত সম্পর্ক রহিত কল্পিত পীরও মুসলিমদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গ, সিন্ধি, মোমবাতি ইত্যাদি লাভ করতে থাকেন। অনেক খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুসলিমদের সুখ সমৃদ্ধি এবং বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ্যরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের আল্লাহর স্থান দখলকারীর ভূমিকায় এবং আংশিকভাবে অদ্যাবধি সেই স্থানই তারা দখল করিয়া আছে।”[11]

এ তো হলো সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা। অপর পক্ষে যারা ইসলামকে একটু বুঝে শুনে সঠিকভাবে ঈমান এনেছিলেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের হাতে এমন কোনো দলীল প্রমাণাদি নেই যা এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা তাওহীদকে এর প্রকারাদিসহ এবং শির্ককে এর কারণসমূহসহ জেনেছিলেন। আমরা যদি ধরে নেই যে, তারা এ সব বিস্তারিতভাবে জেনেছিলেন, তথাপি এ কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, শয়তান তাদের কারো মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল অথচ প্রকৃত অর্থে মন্দ এমন সব ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছিল, যেমনটি সে মানব জাতির পথ ভ্রষ্টতার উষালগ্নে ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নছর এর অনুসারীদের প্রতি এ সব ছড়িয়ে দিয়েছিল।

শয়তান অত্যন্ত সন্তর্পণে তাদের মাঝে তা ছড়িয়ে না দিয়ে পারে কেমন করে? যেখানে সে তা ভারতের মুসলিম জনপদের মধ্যে এখানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই অতি সন্তর্পণে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর সে কারণেই আমরা মুজাদ্দিদে আলফে ছানী আল্লামা শেখ আমহদ ছরহিন্দী (রহ.)-কে (১৫৬৮-১৬২৪ খ্রি.) সে সর্বের প্রতিবাদ করতে দেখতে পাই। তিনি তৎকালীন ভারতের মুসলিমদের মাঝে, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার সূফীদের অনুসারী ও মোগল সরকারের দরবারী আলিমদের মাঝে যে সকল শির্ক, বেদআত ও ধর্মান্দ্ৰোহী কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেছিলেন, যার জন্যে তাঁকে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের মহান সংস্কারক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।[12]

সম্রাট জাহাঙ্গীর এর দরবারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে সেজদা না করার কারণে তিনি কারাবন্দী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কারাগারে বসে তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কর্ম চালিয়ে যাওয়ার ফলে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব দেখে জেল কর্তৃপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয়েছিল যে, “এ ব্যক্তির সংস্কারমূলক আহ্বানের প্রভাবে জেলখানার পশুসুলভ আচরণের মানুষগুলো মানুষের রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে এবং সেখানকার মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হতে শুরু করেছে।”[13] তাঁর এবং তাঁর এ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, “সে সময়ে যদি শেখ আহমদ ছরহিন্দীর শুভাগমন না

হতো, তা হলে প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বেই ভারতের মাটি থেকে ইসলামের নাম ও এর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।”[14]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন : “শেখ আহমদ হুরহিন্দী যে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন শেষ পর্যায়ে এসে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা যে সংস্কারমূলক আন্দোলন দাঁড় করেছিলেন, সে আন্দোলনের সাথে তা একীভূত হয়ে যায়। কালের পরিক্রমায় এই দুই সংস্কারকের যাবতীয় প্রচেষ্টা ‘রায়ব্রেলভী’ এর প্রখ্যাত মুজাহিদ পরিবারের সাথে এসে মিলে যায়। সৈয়দ আহমদই হলেন মুজাহিদ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদের ভারতের মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের পিছনে একক লক্ষ্য ছিল মুসলিম রাজশক্তির বিনাশ এবং অমুসলিম রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র মুসলিম ভারতের জাতীয় জীবন স্বাভাবিকভাবে যে সব মারাত্মক অভিশাপে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল তা থেকে ভারতের মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা। নওয়াব সুলায়মান জাহকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমেও তাঁর এ উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। সে পত্রে তিনি বলেন: ভাগ্যক্রমে এই দেশের শাসন ও রাজত্বের অবস্থা কিছুদিন হতে এরূপ হয়ে দাড়িয়েছে যে, খ্রিষ্টান ও হিন্দুগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে এবং ঐ অঞ্চলগুলোকে অত্যাচারে, অবিচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

ঐসব অঞ্চলে শির্ক ও কুফরের রীতিনীতি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ইসলামের অনুষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমার অন্তর দুঃখে ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েছে, হিজরতের আগ্রহে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে, ঈমানের অভিমান আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলে এবং জেহাদ প্রবর্তনের আগ্রহে আমার মস্তক আলোড়িত হতে থাকে।”[15]

>

## ফুটনোট

[1]. কুড়িগ্রাম জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ চালিয়ে মাটির নিচে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। যার ইটের গায়ে কালেমায়ে তাইয়্যিহাহ ও হিজরী ৬৯ সালের বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী প্রথম শতকেই আরব বণিকদের দ্বারা এদেশে ইসলামের গুণাগুণ ঘটেছিল। দেখুন : গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক; (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩। সংক্ষিপ্তাকারে।

[2]. আব্দুল মান্নাম তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম; (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

[3]. তদেব; ৬৩।

[4]. শেখ ফরীদ উদ্দিন বর্তমান ফরিদপুর জেলায় আগত প্রখ্যাত ‘আবিদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর আগমনের সঠিক তারিখ জানা যায় নি। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর নামের সাথে সম্পর্ক রেখে পরবর্তীতে ফরিদপুর জেলার নামকরণ করা হয়। এ আবিদের নামে ফরিদপুর জেলার কালেক্টরেট ভবনের নিকটবর্তী এলাকায় যশোর বোর্ডের নিকটতম একটি গাছের নিচে একটি দরগাহ রয়েছে। গোলাম ছাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯৮।

- [5]. তদেব; পৃ. ৩৫; পীর চেহেল গাজী; (স্থান বিহীন: ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রি.) পৃ.।
- [6]. গোলাম ছাকালারেন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬; মোহর আলী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪।
- [7]. গোলাম ছাকালারেন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩-১৪; এ. এইচ. এম শামসুর রহমান, আপন গৃহে অপরিচিত; (খুলনা : জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), প্রবন্ধ : “সংস্কৃতির রূপান্তর না শির্ক-বিদ‘আতের নামান্তর”, পৃ. ৭; গোপাল হালদার রচিত “সংস্কৃতির রূপান্তর” গ্রন্থের পৃ. ১৯৮।
- [8]. দেখুন : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান; পৃ. ৮২। তাতে একটি কবিতা রয়েছে, যাতে আল্লাহকে ইশ্বর, আদমকে অনাদি নর, মা হাওয়াকে কালী, রাসূলকে চৈতন্য, খোআজ খিজিরকে বাসুদেব, কুরআনকে পুরান আর পীরদেরকে হিন্দুদের গুরুজনদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- [9]. দেখুন কবি মোহাম্মদ আকবর (জন্ম ১৬৫৭ খ্রি.), পুথিকাব্য; পৃ. ৮৫। মুহাম্মদ ইউনুছ রচিত “চৌধুরী লড়াই” গীতির বন্দনায় তা বর্ণিত হয়েছে।
- [10]. ‘নূরুল্লাহর ও কবির কথা’ গীতি কাব্যে রয়েছে : “বিসমিল্লাহ ও শ্রী বিষ্ণু একই কথা। আল্লাহ দু’অংশে বিভক্ত হইয়া রাম ও রহীম হইয়াছেন”। দেখুন : আপন গৃহে অপরিচিত; প্রবন্ধ : সংস্কৃতির রূপান্তর না শির্ক-বিদ‘আতের নামান্তর; পৃ. ৬।
- [11]. মাওলানা আকরম খাঁ, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস; (ঢাকা : আজাদ অফিস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ.৮৬।
- [12]. তদেব; পৃ. ১৬৭।
- [13]. তদেব; পৃ. ১৪৮।
- [14]. তদেব; পৃ. ১৪৯।
- [15]. তদেব; পৃ. ১৫২।